The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রোকেয়ার শিক্ষাদর্শনঃ স্বরূপ অন্বেষণ

[The Educational philosophy of Rabindranath Tagore and Rokeya: An Inquiry into their Essence]

Dr. Mahamuda Akther
Associate Professor, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 25 February 2025
Received in revised: 22 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Rabindranath Tagore, Rokeya Sakhawat Hossain, Pedagogy, Traditional Education, Culture.

ABSTRACT

Rabindranath Tagore (1861-1941) and Rokeya Sakhawat Hossain (1880-1932) are ceremonial figures in colonial India. Despite being nineteen years apart in age, these two intellectuals were nearly the same in terms of their ideas, work, and activities, as well as their style, and social reformation pattern. Although they were not equal in scope, depth, and diversity of literature, they were devoted to developing an alternative, effective education system beyond the existing colonial educational structure. In the present study, we investigate through a comparative discussion how Rabindranath Tagore and Rokeya Sakhawat Hossain modified and modernized the usual colonial education system. Both litterateurs realized there is no alternative to Indigenous pedagogy for the ordinary people and society's freedom, development, modernization, and progress. Therefore, Rabindranath Tagore built Ashramic schools like Shantiniketan, Visva-Bharati, and Sriniketan by adopting a logical, pragmatic approach to modernize the Indian traditional pedagogy irrespective of caste and religion. On the other hand, Rokeya founded a Sakhawat Memorial Girls School aiming to expand Bengali Muslim women's education in the contemporary context. Her educational philosophy was intended to free women from slavery in the chains of patriarchal society and establish women's social status, rights, and dignity. Both Rabindranath and Rokeya emphasized that learning methods close to nature are needed to achieve the goals. Thus, they created the curriculum not only for a diploma but also for self-improvement and socioeconomic enhancement, making their educational philosophy more acceptable and modern in the judgment of the times and context.

শিক্ষা মানবজীবনের মৌলিক ভিত্তি ও উন্নয়নের অনিবার্য উপাদান। সমাজ-সংস্কার, নারী-মুক্তি, জাতীয় জাগরণ কিংবা মানবিক বোধের বিকাশ সবক্ষেত্রেই শিক্ষা একটি গভীর ঐতিহাসিক ও নৈতিক ভূমিকা পালন করে থাকে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ এক গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এই সন্ধিক্ষণে যাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে নবরূপে গঠনের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯২০) নাম বিশেষভাবে উজ্জ্বল। এই সময়কালে দুই ভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও লিঙ্গপরিচয়ের প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রোকেয়া নিজ নিজ প্রেক্ষপট থেকে বিকল্প শিক্ষাভাবনার পথ রচনা করেন। বয়সের ব্যবধানে তাঁদের মধ্যে প্রায় দুই দশকের পার্থক্য থাকলেও, উভয়ের শিক্ষাদর্শনে এক গভীর মানবিকতাবোধ, নৈতিক দায়বদ্ধতা ও আত্মমুক্তির সূত্র নিহিত ছিল। একজন মুসলিম নারী সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক হিসেবে রোকেয়া যেখানে নারীশিক্ষাকে সামাজিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে শিশুর স্বাধীন বিকাশকে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁদের শিক্ষাদর্শনের উৎস, উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, মাধ্যম, শিখন পরিবেশ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলনা করে দেখা হবে, যাতে তাঁদের শিক্ষাভাবনার স্বরূপ অন্বেষণ সম্ভব হয়।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে প্রবর্তিত শিক্ষানীতিগুলো একদিকে আধুনিকতা, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রবেশ ঘটলেও অন্যদিকে তা দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সংঘাতে পড়ে। প্রাচীনকাল থেকে উপনিবেশপূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে বৈদিকশিক্ষা, ব্রাহ্মণ্য-উপনিষদীয় শিক্ষা, বৌদ্ধ এবং ইসলামি শিক্ষাসহ ধর্মীয় ও স্থানীয়ভিত্তিক অন্যান্য দেশীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এদেশে ইংরেজ আগমন ও

তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় দুটো ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠে। এদেশে পাশ্চত্য শিক্ষার প্রবর্তনের প্রথম সূচনা মিশনারিদের মাধ্যমেই হয়। নানান দেশের মিশনারিদের অংশগ্রহণ ভারতীয় অঞ্চলে বহুমুখী শিক্ষাধারার সূচনা করে যদিও তা ছিল সমন্বয়হীন এবং শিক্ষার নামে যে ধর্মীয় আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা ছিলো সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার সূক্ষ্ম রূপ। মিশনারীদের পর ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা ধাপে ধাপে মূলত তিনটি গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হতে থাকে। যথা (ক) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি; (খ) ব্রিটিশ সরকার; (গ) ভারতীয় সমাজ সংস্কারক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে। লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক কাজের জন্য দক্ষ ও অনুগত ক্লার্ক শ্রেণি তৈরি করা। তাঁর উজ্জ্বল উদাহরণ ১৮৩৫ সালের ম্যাকলের মিনিট; উডস ডেস প্যাচ (১৮৫৪) এবং হান্টার কমিশন (১৮৮২)। টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে (১৮০০-১৮৫৯) প্রথম ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাত করেন। তাঁরই পরামর্শে ভারতবর্ষের স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করা হয়। কেননা ' লর্ড ম্যাকলের দৃষ্টিতে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি বা প্রাচ্যের কোনো ভাষা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উপযুক্ত ছিল না। এমনকি তাঁর কাছে দেশীয় অন্যান্য মাতৃভাষাও নিকৃষ্ট ছিল।'[১] তাঁর উদ্দেশ্য ছিল,

> We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern- a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and intellect.[2]

পরবর্তীতে ভারতীয় উপনিবেশ শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় সংস্কার শাসকবর্গ করেছেন, তা ম্যাকলের 'Downward Filtration Theory'-এর নতুন সংস্করণ। কিন্তু লর্ড ম্যাকলের শিক্ষানীতি, উডের ডেসপ্যাচ, হান্টার কমিশন কিংবা স্যডলার কমিশনের ফলে ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল তা জনসাধারণের কল্যাণে এসেছে এমনটা বলা যায় না। তবে ব্রিটিশদের মনোকামনা পূরণে মধ্যস্বত্তভোগী সমাজে তৈরি হয়েছিল যারা শাসকশ্রেণিকে সুবিধা দিয়েছে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে স্বাধীনতা আন্দেলনের সময় পর্যন্ত যখন ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় তৈরি হয়, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসা অনেক ভারতীয় নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে; যাঁরা শিক্ষাকে জাতীয় জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন; এবং সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুসংস্কার-প্রথার সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করে স্বদেশের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রমুখ। যাঁরা ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিরূপ প্রভাব বুঝতে পেরে শিক্ষাকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও প্রস্তাবনা রেখেছিলেন। তাঁদেরই ভাবনার যোগ্য উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যাঁরা শিক্ষা ও সমাজচিন্তায় এক ভিন্নমাত্রা যোগ করেন। এই ইতিহাস ও সমাজ-পরিস্থিতি থেকেই গড়ে ওঠে তাঁদের স্বতন্ত্র শিক্ষাদর্শন, যা এই প্রবন্ধে অন্বেষণের প্রয়াস থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন

ঔপনিবেশিক শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত উপযোগিতামূলক ও শাসনকেন্দ্রিক ছিল। এই কাঠামোর মধ্যে শিক্ষার্থী এক নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা, পাঠক্রম ছিল পরীক্ষানির্ভর। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক ঐতিহাসিক ও মননশীল শিক্ষাদর্শন নির্মাণ করেন, যার কেন্দ্রে ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা, সৃজনশীলতা, মানবিকতা ও সর্বজনীনতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে আমাদের শিক্ষা, শিক্ষানীতি-পদ্ধতি-প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা-মতামত-সমালোচনা। বহু প্রবন্ধ-ভাষণ-চিঠিতে তিনি এ বিষয়ে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল সত্যের অন্বেষণ, মুক্ত চিন্তা, শিল্পবোধ ও অন্তরাত্মার জাগরণ। এবারে এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে প্যাডাগজির আলোকে তাঁর শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়াস থাকবে।

শিক্ষার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনার অন্যতম মৌলিক দিক হলো শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার্থীর চিন্তা, কল্পনা ও অনুভবের স্বাধীনতা না থাকলে প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর মনে যেন প্রশ্ন জাগে, সৃজনের আনন্দ জন্ম নেয়-এই চেতনায় তিনি গড়ে তোলেন শান্তিনিকেতনের পাঠদান। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার যে শিক্ষা চালু করেছিল, তা ব্যক্তিসত্তা ও চিন্তার জগৎকে চেপে ধরে, মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে রুদ্ধ করে দেয়। ফলে শিক্ষার্থীরা সত্য উপলব্ধি করতে শেখে না। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না- বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়। [৩]

অর্থাৎ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল, আগ্রহ ও প্রশ্ন উদ্রেক করে অন্তরজগতের গভীরে আলো জ্বালানো, যাতে সে তার চারপাশের জগৎকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক কেবল জ্ঞানের দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'The Schoolmaster' (১৯২৪) প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত কতৃর্ত্বমূলক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বন্ধুত্ব, স্বাধীনতা ও মানবিক বন্ধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা স্কুলে শিক্ষকের বিরূপ আচরণই তাঁর চিত্তে স্কুল বিমুখতা তৈরি করেছিল। তা থেকেই তিনি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

পাঠক্রম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পাঠক্রমে প্রথাগত রুটিনভিত্তিক, পরীক্ষামুখী পাঠ্যবস্তুর বদলে জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেকারণেই তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের পাঠ্যসূচি ছিল নমনীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর পাঠক্রমের মূল স্তম্ভগুলো হলো:

প্রকৃতিসংলগ্ন শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা' এই আদর্শ সামনে রেখে। তিনি শহুরে চার দেওয়ালের ভেতরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ মনে করতেন। কেননা প্রকৃতি শিশুদের কৌতূহল জাগায় এবং মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়। তাঁর মতে,

> আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয়, তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশে তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীত চর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।[৪]

এই ভাবনারই বাস্তব প্রয়োগ তিনি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে।

সাংস্কৃতিক চর্চাভিত্তিক পাঠক্রম- রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনে সাংস্কৃতিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করে কবিতা, সংগীত, নৃত্য, নাটক ও চিত্রকলা ইত্যাদি সহ বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম পাঠক্রমে অর্ন্তভুক্ত করেন।

কর্মমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শে শারীরিক শ্রম ও বাস্তবজীবনের দক্ষতা অর্জন ছিল গুরুত্বপূর্ণ দিক। শান্তিনিকেতনে কৃষি, হস্তশিল্প ও উদ্যানবিন্যাস শেখানো হতো বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯০৫ সালে কুসুমতো সান নামে এক জাপানি দারুশিল্পী শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের হাতে-কলমে আসবাব বানানো, বেঞ্চ তৈরি, ছোটোখাটো কাঠের জিনিস বানানোর প্রশিক্ষণ দিতেন।

বিজ্ঞানশিক্ষা: শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যক্রম চালু করা হয়। এই কারণেই তাঁর শিক্ষালয়ে সত্যেন বসুর মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানী শিক্ষাদানে যুক্ত হন, যার ফলে গবেষণাভিত্তিক বিজ্ঞানশিক্ষা আরও জোরদার হয়।

বিশ্বজনীন পাঠক্রম- শান্তিনিকেতনে ও বিশ্বভারতীতে বাংলা, সংস্কৃত, পালি, চীনা, আরবী, ফারসি, তিব্বতি, জাপানি, জার্মান, ইংরেজি, ফরাসি সহ নানা ভাষায় পাঠদান ও ভাষাচর্চা চালু ছিল। ভাষাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মতত্ব, সংগীত ও সংস্কৃতিচর্চা পাঠসূচির অর্ন্তভুক্ত ছিল, যা শিক্ষার্থীদের শুধু ভাষাগত দক্ষতা নয় বরং বিশ্বসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করতো। উপরের মূল স্তম্ভ ছাড়াও তিনি নীতিশিক্ষা, নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে পাঠক্রমে অর্ন্তভুক্ত করেন।

শিখন-পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালয় শান্তিনিকেতনের ধারণা মূলত মুক্ত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। তাঁর মতে, 'অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভব না; সেখানে বিদ্যা শিক্ষার কারখানা-ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।'[৫] শান্তিনিকেতনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আশ্রমভিত্তিক এই শিক্ষাব্যবস্থা- যা ছিল শহরের ক্লাসঘর-নির্ভর পাঠক্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লেখেন,

> আদর্শ-বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন। এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকবে। [৬]

এখানে শিক্ষার্থী শুধু বিদ্যার্জন করে না, বরং আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধ্যান-চিন্তা ও চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে মানবিক উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হয়।

শিক্ষার মাধ্যম

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষায় শিক্ষা মানবজগতের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক স্থাপন করে। সেকারণেই তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন,'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।'[৭] শান্তিনিকেতনে বাংলা ছিল শিক্ষার প্রধান মাধ্যম, যেখানে সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞান এমনকি দর্শনও মাতৃভাষায় শেখানো হতো। পাশাপাশি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাও শেখানো হতো- তবে চাপিয়ে নয়, প্রয়োজন ও আগ্রহভিত্তিকভাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বহুভাষিক শিক্ষা সংস্কৃতির গভীরতা দেয়, কিন্তু ভিত্তি হতে হবে মাতৃভাষার ওপর। ফলে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যকে স্বীকার করলেও তিনি সেটিকে শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি। যদিও বিশ্বভারতীতে সংস্কৃত, পালি, আরবী, চীনা ও ইংরেজী সব ভাষাকেই পাঠ্যক্রমে অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সবচেয়ে গভীর দিক হলো ব্যক্তির আত্মজাগরণ ও বিশ্বসত্তা বিকাশ। তাঁর ভাষায় 'কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে।'[৮] এটি কেবল বই পড়া বা ডিগ্রি অর্জনের বিষয় নয়; বরং জীবনকে উপলব্ধি করার উপায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য আশ্রম (১৯০১), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) এবং শ্রীনিকেতন (১৯২২) উপনিবেশক পাঠক্রমের বিপরীতে আত্মিক, নান্দদিক ও সমাজমুখী শিক্ষার এক বিকল্প দৃষ্টান্ত।

রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যখন ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই আর্বিভাব ঘটে রোকেয়ার মতো প্রগতিশীল মননের এক দুর্বার কণ্ঠস্বরের। এই সময় মুসলিম সমাজে বিশেষ করে নারীদের প্রতি শিক্ষার পথ ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ। এই পটভুমিতে রোকেয়ার শিক্ষদর্শন শুধু বিদ্যার আলো জ্বালায়নি, বরং একটি বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল, যা নারীকে আত্মমর্যাদাশীল, যুক্তিবাদী ও অধিকার সচেতন হিসেবে গড়ে তোলার সাহস দিয়েছিল। এবারে প্যডাগজির আলোকে রোকেয়ার শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হলো:

শিক্ষার্থী

রোকেয়ার কাছে শিক্ষা কেবল জ্ঞান দেওয়ার কাজ নয়-বরং শিক্ষার্থীর ভেতরকার মানুষকে জাগিয়ে তোলার প্রক্রিয়া। তিনি শিক্ষার্থীদের শেখাতে চেয়েছিলেন অন্ধ আনুগত্য নয়, যুক্তিপূর্ণ সংশয় হতে হবে শিক্ষার ভিত্তি। প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন,

> ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা সৎকার্য্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা সূক্ষভাবে চিন্তা করিতে শিখি-তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।[৯]

রোকেয়া শিক্ষার্থীর ধারণায় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের প্রতিবাদ করেন। মেয়েরা যে পড়তে পারবে না, চিন্তা করতে পারবে না- এই সামাজিক ধারণাকে তিনি একেবারে ভেঙে ফেলেন। তিনি তাদের আত্মনির্ভর হতে শেখান- অর্থনৈতিকভাবে, মানসিকভাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে। তাঁর মতে,

> পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাজিস্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ- সবই হইব! ..... আমরা যদি রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।[১০]

রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ছিল সমমর্যাদাভিত্তিক ও উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, যুক্তিশক্তি, নৈতিকতা ও মানবিক বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা কেবল গৃহস্থালির যন্ত্র না হয়ে সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হয়।

পাঠক্রম

রোকেয়ার শিক্ষাভাবনায় প্রচলিত পাঠক্রম নারীর জন্য বৈষম্যমূলক ও পশ্চাৎমুখী। নারী শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে সমাজের মনোভাব ছিল, 'স্ত্রীলোকেদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্ব্য, চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারি খানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশী আবশ্যক নাই।'[১১] কিন্তু তিনি মুসলিম নারীদের যথার্থ ও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' স্থাপন করে পাঠ্যক্রমে এই বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করেন:

ভাষা শিক্ষা: উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি ও পরে বাংলা অর্ন্তভুক্ত হয়। তিনি ভাষাকে সামাজিক অধিকারে অংশ হিসেবে দেখতেন ।

গণিত ও বিজ্ঞান: নারীর যৌক্তিকতা ও যুক্তিবোধ গঠনের জন্য গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করেন। *সুলতানার স্বপ্ন* তে রোকেয়া নারীর বিজ্ঞান চর্চা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

ইতিহাস ও ভুগোল: বিশ্বজ্ঞান, নাগরিকতা ও সমাজের বোধ গঠনের অংশ হিসেবে এগুলো অর্ন্তভুক্ত করেন।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা: নারীদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য তিনি গৃহস্থালি, সেলাই, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা শেখানোর ওপর জোর দেন। কেননা তাঁর মতে, 'সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।'[১২] পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এ ধরনের কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

নৈতিকতা, ধর্মতত্ত্ব ও শারীরিক শিক্ষা: ধর্মীয় সহনশীলতা ও নৈতিক বোধ তৈরির জন্য তিনি তফসিরসহ কোরআন পাঠ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর পাঠ্যক্রমে শারীরিক শিক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

রোকেয়া পাঠক্রম নির্ধারণে এমন সব বিষয়ই যুক্ত করেন যার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের চিন্তা, প্রশ্ন ও যুক্তি শেখানো, যা কেবল পুঁথিগত নয়, জীবনঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন প্রবন্ধ যেমন 'সুগৃহিণী', 'স্ত্রীজাতির অবনতি', 'সুবেহ্ সাদেক', 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি' প্রবন্ধের বিভিন্ন আলোচনায় তাঁর এই পাঠ্যক্রমের প্রমাণ মেলে।

শিখন-পরিবেশ

রোকেয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিখন পরিবেশ ছিল নারীর জন্য ভীতিমুক্ত ও আত্মনির্ভরতা গঠনের ক্ষেত্র। তিনি জানতেন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নারীশিক্ষার অন্যতম বাঁধা, তাই, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষকদেরই নিয়োগ দেন। তাঁর শিখন পরিবেশ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ নয়, বরং সমন্বয় ছিল। তিনি কোরআনের নির্দেশনা যেমন মানতেন, তেমনই বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণকেও গুরুত্ব দিতেন। এই চিন্তাচর্চামূলক পরিবেশই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষার মাধ্যম

রোকেয়ার মতে, মাতৃভাষায় শিক্ষা আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি। একটি প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, 'এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষা বলে দাবী করে বটে কিন্তু এমন বিকৃত উর্দ্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়।'[১৩] তাই তিনি তাঁর স্কুলে বাংলা ও ইংরেজিকে সমানভাবে স্থান দেন। ফলে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'–এ তিনি ভাষার ব্যবহারকে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করেন এভাবে-বাংলা (প্রধান মাধ্যম), ইংরেজি (উচ্চতর জ্ঞানের জন্য) ও আরবী/উর্দু (ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞানের জন্য সীমিতভাবে)। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ সমূহ বিশ্লেষণ করে রোকেয়ার শিক্ষা মাধ্যমের অভিপ্রায় বুঝতে পারা যায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পুরুষদের কর্মজীবী ও আনুগত্যপরায়ণ নাগরিকে পরিণত করা। নারীদের জন্য শিক্ষা ছিল একটি সাজানো সামাজিক গৃহবন্দিত্বের প্রলেপমাত্র- ঘরের কাজ, ধর্মপালন ও পুরুষের সেবা। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে রোকেয়া বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ান। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মজাগরণ, যুক্তিচর্চা ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস ও অর্জন। তিনি চাইতেন, নারী যেন নিজের অস্তিত্বকে বুঝতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে এবং সমাজের নির্যাতন-নির্দেশিত কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার এই উদ্দেশ্যই তিনি *পদ্মরাগ* এর দীন তারিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন বলিষ্ঠভাবে যুক্তিবাদী। *সুলতানার স্বপ্ন*-এ তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে নারী শাসিত সমাজে বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর শিক্ষাই সমাজ রূপান্তরের মাধ্যম হতে পারে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রোকেয়া- দুই ভিন্ন ধর্ম, লিঙ্গ ও সামাজিক অবস্থানের চিন্তাবিদ; তাঁদের নিজস্ব প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষাকে দেখেছেন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে। তাঁদের শিক্ষাদর্শন ভিন্নতাপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক সূত্র থেকে উৎসারিত হলেও উভয়ের চিন্তায় কিছু মৌলিক মিলও লক্ষণীয়। যদিও উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংলাপ বা পারস্পরিক চিঠিপত্র কিংবা অন্য কোনো যোগাযোগ বা সহযোগিতার প্রমাণ মেলে না। 'হয়তো এই দুই যুগান্তকারী স্বপ্নদ্রষ্টা মহান ব্যক্তিত্ব পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলে, তাঁদেরও পরস্পরকে কাছে থেকে জানা-বোঝার সময়, সুযোগ ও উপায় থাকলে বাঙালি জাতির জন্য তা অধিকতর কল্যাণ বয়ে আনত।'[১৪] এ পর্যায়ে তাঁদের শিক্ষাভাবনার ভিত্তিগুলোর একটি তুলনামূলক পাঠ উপস্থাপনের প্রয়াস করা হলো:

দর্শনের ভিত্তি ও লক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানবিকতা, সৃজনশীলতা, প্রকৃতি-সংলগ্নতা এবং বিশ্বনাগরিকতাবোধ। তিনি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে জ্ঞানচর্চার সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন। অপরদিকে রোকেয়ার শিক্ষাভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল নারীর

আত্মমুক্তি, যুক্তিনির্ভর সমাজচিন্তা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল নারীর অধিকার ও অস্তিত্বের প্রশ্ন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে নন্দন ও আত্মিক জাগরণের উপায় হিসেবে দেখেন; রোকেয়া শিক্ষাকে দেখেন প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও সমাজরূপান্তরের কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে।

শিক্ষার্থী ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীকে ভাবেন এক অনুসন্ধানী, স্বাধীন ও আত্মঅন্বেষণকারী ব্যক্তি হিসেবে। রোকেয়া শিক্ষার্থী বিশেষত নারীকে দেখেন অবদমিত সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে, যেখানে শিক্ষার্থীর চেতনার জাগরণ ঘটানো অবশ্যম্ভাবী।

দর্শনগত ভিন্নতা

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীর সত্তাকে চিরায়ত মানবিকতায় বিস্তৃত করেন, আর রোকেয়া বাস্তবিক নিপীড়িত অবস্থান থেকে তাকে সংগ্রামী চেতনায় স্থাপন করেন।

পাঠক্রম

রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন শিল্প, প্রকৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের সমন্বয়- যেখানে পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে জীবনই হয়ে ওঠে পাঠের বিষয়। রোকেয়া পাঠক্রমে গুরুত্ব দেন ব্যবহারিক জ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও নৈতিক শিক্ষা-যা নারীকে আত্মনির্ভর করে তোলে। রোকেয়ার শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যশিক্ষা নয় বরং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেও সক্রিয় ছিল। আবৃত্তি, অভিনয়, শারীরিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। উভয়েই প্রচলিত 'তোতাপাঠ' ও অনুকরণভিত্তিক পাঠক্রমের বিরোধিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রম ছিল অবিন্যস্ত, মুক্ত ও সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ; সেখানে রোকেয়ার পাঠক্রম ছিল তুলনামূলকভাবে সংরক্ষিত ও বাস্তবমুখী, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপট উপযোগী। রোকেয়া ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠ্যসূচিতে রেখেছিলেন যাতে ধর্মের নৈতিক দিকগুলো শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ তৈরিতে সহায়তা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয় প্রথমদিকে ধর্মীয়ভাবে পরিচালিত হলেও ধীরে ধীরে তিনি সেটাকে বহুমাত্রিক ও আর্ন্তজাতিক চেতনায় উন্নিত করেন।

শিখন পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ছিল প্রকৃতির মাঝে মুক্ত শিক্ষালয়, যেখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল স্নেহের ও বন্ধুত্বের। রোকেয়ার স্কুল ছিল নারীদের জন্য এক নিরাপদ, সাহস-উদ্দীপক শিক্ষাক্ষেত্র, যেখানে ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সমাজে স্বকীয় ভূমিকা পালন করা। উভয়েই আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বিকল্প শিক্ষার পরিবেশ নির্মাণে সচেষ্ট হন ও সেই অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিখন পরিবেশ গড়ে তোলেন।

শিক্ষার মাধ্যম

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে জোর দেন, যদিও ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি। অপরদিকে রোকেয়া বাংলাভাষাকে নারীর চিন্তা ও মুক্তির প্রধান মাধ্যম বলে দেখেছেন; ইংরেজিকেও আধুনিক জ্ঞানের পথ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রয়োগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তাঁর শিক্ষাদর্শের মূল ছিল প্রকৃতির মাঝে স্বাধীনভাবে শিখন, শিল্প-সাহিত্য-সংগীত চর্চা ও আনন্দময় পরিবেশে শিখনপ্রক্রিয়া। এই প্রতিষ্ঠান ছিল উপনিবেশিক পাঠ্যবই- নির্ভর শৃঙ্খলাকে প্রত্যাখান করে গঠিত এক 'আশ্রমিক' বিকল্প শিক্ষা কাঠামো। এর উত্তরাধিকার দেখা যায় বিশ্বভারতীতে, শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে। অন্যদিকে রোকেয়া ১৯১১ সালে কলকাতার বাকেরগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল- মুসলিম নারীদের পর্দা ও অশিক্ষার আবরণ ভেদ করে শিক্ষার আলোয় আনয়ন। এটি ছিল নারী শিক্ষার এক বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ, যেখানে নারীর মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতায়নের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে স্কুলটি হয়ে ওঠে উপমহাদেশে মুসলিম নারীর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জনের স্থান। এর উত্তরাধিকার দেখা যায় আজকের নারীশিক্ষার বিস্তৃত পরিসরে।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা বাস্তবতায় যেখানে জ্ঞানকে পণ্যায়ণ, পাঠক্রমকে পরীক্ষামুখীতা এবং শিক্ষাকে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সীমায় আবদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা এক গভীর অর্ন্তদৃষ্টি ও বিকল্প সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ঐতিহাসিক বা চিন্তাগত উদাহরণ নয়, বরং তা সমকালীন শিক্ষা-সংকট

মোকাবেলায় কার্যকর নৈতিক ভিত্তি গঠনে সহায়ক। বিশেষ করে নম্বর-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং সৃজনশীলতার অবমূল্যানের সংকট থেকে মুক্তি পেতে রবীন্দ্রনাথের মতন 'আনন্দের শিক্ষা', প্রকৃতিনির্ভর জ্ঞানচর্চা এবং 'শিল্প-সংস্কৃতিনির্ভর পাঠক্রম' প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। নারী শিক্ষায় অবিচার, বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় ও সামাজিক বাঁধা অতিক্রমে রোকেয়ার চিন্তা, যুক্তিনির্ভরতা, স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা এবং ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চা শুধু ইতিহাসের নয়, আজকের শিক্ষা উন্নয়নেরও অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রোকেয়া দুইজন দুই ভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও জীবন পটভূমি থেকে আগত হলেও তাঁদের শিক্ষাদর্শন ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও মানবমুক্তির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যে অভিসারিত হয়েছে। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা ছিল পাঠক্রমের অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিখন পরিবেশ, মাধ্যম ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এই সবগুলো স্তরেই তাঁরা প্রচলিত ঔপনিবেশিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে এক নতুন শিক্ষাভাবনার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। একদিকে রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন নারীকে সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করার দিক নিবদ্ধ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ছিল অনাত্মীয়তা ও নিষ্প্রাণ শিক্ষার বিরুদ্ধে মানবিক ও সৃজনশীল বিকল্প শিক্ষার নির্মাণ। আজকের সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে মূল্যায়নের দাবি রাখে, যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পেশাগত দক্ষতা নয়, বরং মানুষের অন্তর্জগৎ নির্মাণ। রোকেয়া ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই পথপ্রদর্শকের শিক্ষাদর্শন তাই আমাদের সামনে এক মানবিক, সাম্যবাদী ও সংস্কৃতিনির্ভর শিক্ষার আদর্শ মডেল তুলে ধরে।

তথ্যনির্দেশ

[১] হরিসাধন গোস্বামী, *ভারতের শিক্ষা-ইতিহাস*, পশ্চিম রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.২১৪-২১৫

[২] Macaulay, Thomas Babington, Minute on Indian Education, 2 Feb, 1835, In Selections from Educational Records, Part 1 (1781-1839). Edited by H. Sharp. Superintendent, Government Printing, Calcutta, 1920, p. 116

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার হেরফের', *শিক্ষা*, রবীন্দ্র-রচনাবলি, ত্রয়োদশ খণ্ড (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত), ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৮২

[৪] *প্রাগুক্ত*, 'শিক্ষা সমস্যা', শিক্ষা, পুনরমুদ্রণ, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৬

[৫] *প্রাগুক্ত*, 'শিক্ষাসমস্যা' *শিক্ষা/সংযোজন*, রবীন্দ্র-রচনাবলি, ত্রয়োদশ খণ্ড (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত), পৃ. ৫০১

[৬] *প্রাগুক্ত* পৃ. ৫০৩

[৭] *প্রাগুক্ত*, 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' *শিক্ষা/সংযোজন*, রবীন্দ্র-রচনাবলি, ত্রয়োদশ খণ্ড (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত), পৃ. ৬২১

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯০

[৯] মিসেস আর এস হোসেন, 'স্ত্রী জাতির অবনতি', *মতিচূর, প্রথম খণ্ড*, পুনরমুদ্রণ, রোকেয়া রচনাবলী (আবদুল কাদির সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৯

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[১১] *প্রাগুক্ত*, 'অর্দ্ধাঙ্গী' *মতিচূর: প্রথম খণ্ড*, পুনরমুদ্রণ, রোকেয়া রচনাবলী (আবদুল কাদির সম্পাদিত), পৃ. ২৮

[১২] *প্রাগুক্ত*, 'সুগৃহিণী' *মতিচূর: প্রথম খণ্ড*, পুনরমুদ্রণ, রোকেয়া রচনাবলী (আবদুল কাদির সম্পাদিত), পৃ. ৩৩

[১৩] *প্রাগুক্ত*, 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি', *অগ্রন্থিত প্রবন্ধ*, পুনরমুদ্রণ, রোকেয়া রচনাবলী (আবদুল কাদির সম্পাদিত), পৃ. ২৩০

[১৪] পূরবী বসু, *রেকেয়া ও রবীন্দ্রনাথ কাছে থেকেও দূরে*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯৬